জঙ্গিবাদ বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ করে দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা

নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে শুরু করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালে জেএমবির ৬১টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এরপর সারা দেশে ছোট-বড় আরও অনেক সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ে গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয়। সেখানে ৫ জঙ্গিসহ ২৯ জনের প্রাণহানি ঘটে।

দুই দশকে এসব হামলার শিকার হয়েছেন খোদ বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশকে জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি ঘোষনা দেন জিরো টলারেন্সের। এটা যে কোন মুখের কথা ছিলো না তা বাংলাদেশ বুঝতে শুরু করেছে। একের পর এক জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান, একের পর এক নৃশংস হামলার পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন জঙ্গিমুক্ত দেশে পরিণত হতে চলেছে।

নানা চড়াই উৎরাইয়ের পর বিশ্বে জঙ্গিবাদ দমনে যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ তার ক্যাপ্টেন বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেশব্যাপী জঙ্গিবিরোধী অভিযানে এই সাফল্য অর্জন করেছে। বৈশ্বিক ইনডেক্সে হাই রিস্কের (উচ্চ ঝুঁকি) দেশ থেকে লো রিস্কের (নিম্ন ঝুঁকি) দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) তত্ত্বাবধানে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করলেও তা যৌথ বাহিনীর ব্যাপক অভিযানের মুখে অনেকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

গোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই)-২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী এর সূচকে বাংলাদেশ তিন ধাপ উন্নতি করেছে। অর্থাৎ দেশে সন্ত্রাসবাদ আরও কমেছে, দেশ নিরাপদ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো করা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান

দ্বিতীয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারতের চেয়েও জঙ্গি দমনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদ পুরাপুরি নির্মূল না হলেও জঙ্গি সংগঠনগুলোর মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এখনও অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে বেশকিছু জঙ্গি সংগঠন।

পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ সাল থেকে ২০২৩ সাল গত ২২ বছরে সারাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ক প্রায় ২ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৯ হাজারেরও বেশি জঙ্গি। এসব জঙ্গিরা হচ্ছে জেএমবি, নব্য জেএমবি, আনসার আল ইসলাম, হরকত-উল-জিহাদ হুজি, হিযবুত তাহরির, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৯-২০১৩ সালে, ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মী, ভিন্নমতের ইসলামী মতাদর্শের অনুসারী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং বিদেশীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ দেশে জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছিল। তবে এখনো পুরনো জঙ্গি সংগঠন জএমবি, আনসার-আল ইসলাম ও হুজিবি সংগঠিত হওয়ার সময়ে অনেক জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে। নব্য জেএমবির সর্বশেষ আমির মেহেদি হাসান জন তুরস্কে বসে সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মুখে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাস, হরকাতুল জেহাদের হুমকি ধামকির বিপরীতে বিশুদ্ধ বাংলাদেশ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে। দেশে এখনো পর্যন্ত জেএমবি, শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, জেএমজেবি, হিজবুত তাহরির, হুজি-বি, এবিটি, আনসার আল ইসলাম এবং আল্লাহ দল নামে আটটি জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারের কঠোর ভূমিকার কারণে দেশের জঙ্গিবাদ নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।

বলতে দ্বিধা নেই, জঙ্গিবাদ দমনে ২০১৬ সালে গুলশানে হলি আর্টিজানে হামলার ঘটনার আগে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশের তেমন দক্ষতা ছিল না। এরপর গঠন করা হয় পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট,

ডিএমপির কাউন্টার-টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইনভেস্টিগেশন সেন্টার এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ইন্টারসেপশন ইউনিট জঙ্গিবাদ দমনে সরাসরি কাজ করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইনে জঙ্গিদের তৎপরতা ঠেকাতেও সতর্ক রয়েছে এসব বাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।’ এ দেশের মানুষ ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ও তাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করে। শিশুদের জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে রেখে একটি আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখতে হজযাত্রী এবং আলেম-ওলামাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আপনাদের (হজযাত্রীদের) এবং আলেম-ওলামাদের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি যাতে আমাদের শিশুরা এটি থেকে দূরে থাকতে পারে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুত হতে পারে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, যারা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করছে তারা সব ধর্মেই আছে। ‘যদি কেউ মনে করে যে তারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে বেহেশতে যাবে, তা কখনোই হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা বলেননি এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা বলেননি।

তিনি এই কথাগুলো বিশ্বাস করেন বলেনই তার সরকারের প্রথম মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। অপরাধ দমন, অপরাধী শনাক্তকরণ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ, মানবপাচার রোধ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও কৃষি ভাবনা

বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অধিকার আদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা যুগিয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের

মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে, নিজেকে সঁপে দেন স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের সংগ্রাম। এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- “আমার চাল নাই, ডাল নাই, রাস্তা নাই, রেলওয়ে ভেঙে দিয়ে গেছে, সব শেষ করে দিয়ে গেছে ফেরাউনের দল”।

যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যখন উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের মাঝে কোন আশার আলো দেখতে পাননি, তখন তিনিই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেছিলেন, কৃষিনির্ভর এ দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে কৃষির উন্নতির বিকল্প নেই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলার মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। তিনি দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে “কৃষক বাঁচাও দেশ বাঁচাও” স্লোগানে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন।

কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রথম বার্ষিক বাজেটে, ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকা শুধু কৃষি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। প্রথম বাজেটেই কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে কৃষিখাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেন। বাজেটে ভর্তুকি দিয়ে বিনামূল্যে কীটনাশক ও সার সরবরাহ করেন। এ ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিকর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কৃষি পণ্য বিশেষ করে ধান, পাট, আখের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দিয়েছিলেন। ব্যবস্থা করেছিলেন গরিব কৃষকদের রেশনের।
সহায়-সম্বলহীন ২২ লাখ কৃষক পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেন। তাদের পুনর্বাসনে স্বল্পমূল্যে এবং অনেককে বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রদান করেন। ১৯৭২ সালে বাংলার ভূমিহীন কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে পরিবার প্রতি জমির মালিকানা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় করেন এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ১৩৫ এর মাধ্যমে নদী কিংবা সাগরগর্ভে জেগে ওঠা চরের জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের মাঝে বণ্টন করেন। বিলোপ করেন হাট-বাজারের ইজারা প্রথা।

কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য ১৯৭৩ সালের ৭ নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন কৃষি ব্যাংক, যাতে কৃষক সহজেই কৃষি ঋণ নিতে পারে। মহাজন ও ভূমিদস্যুদের হাত থেকে গরিব কৃষকদের রক্ষাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাস জমি বিতরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ

করেন।

১৯৭২ সালের শেষের দিকে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের জন্য ৪০ হাজার অগভীর, ২ হাজার ৯শ গভীর এবং ৩ হাজার শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে সেচের জমি এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬ লাখ একরে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কেবল ১৯৭২ সালেই ১৭ হাজার ৬১৬ টন উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বিশ্ব বাজারের তুলনায় কম মূল্যে সার সরবরাহ করা হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে রাসায়নিক সার ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪ শতাংশ এবং উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বঙ্গবন্ধুর সরকার কৃষকদের মাঝে দেড় লাখ গবাদিপশু ও ৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেন। ১৯৭৩ সালে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুনঃউদ্যোমে চালুর ব্যবস্থা করেন। সরকারিভাবে খাদ্য মজুতের জন্য ১৯৭২ সালের মধ্যে ১শ গোডাউন নির্মাণ করেন। কৃষিজ পণ্যের ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের শুল্ক থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে। কৃষি গবেষণা ছাড়া যে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এদেশে কৃষি গবেষণাধর্মী কাজ পরিচালনার জন্য তেমন কোনো সমন্বয়ধর্মী প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই তো ১৯৭৩ সালেই কৃষিতে গবেষণা সমন্বয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। সেই সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করেন।

সরকারের কৃষি গবেষণা বিভাগকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠনের জন্য তিনিই উদ্যোগ নেন। ১৯৭৩ সালে ১০ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে পুনর্গঠন করেন। সেই সময় তিনি ঢাকার আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কৃষি পারমাণবিক গবেষণা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (ইনা) প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন, যা ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পর জুট অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে প্রাক্তন জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে পুনর্গঠন করেন। তাছাড়া, তিনি ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ

ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট। একই সঙ্গে হর্টিকালচার উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, তুলা উন্নয়ন বোর্ডসহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন শুধুমাত্র কৃষকদের নিকট সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য। তিনি মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের বিদ্যমান কার্যক্রম ও অবকাঠামো সম্প্রসারিত করেন। মৎস্য ও পশুসম্পদের উন্নতির জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়। এছাড়াও দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে তরান্বিত করতে গড়ে তোলেন মিল্ক ভিটা। একইসাথে ভর্তুকি মূল্যে তিনি কৃষকদের মাঝে ১ লাখ হালের বলদ ও ৫০ হাজার গাভী সরবরাহ করেন। গরিব কৃষকদের মাঝে তিনি সহজ শর্তে ১০ কোটি টাকার ঋণ ও ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ বিতরণের ব্যবস্থাও করেন।

১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ নির্বাচনী জোটের অংশীদার হয়ে প্রার্থী হন কোটালিপাড়া-গোপালগঞ্জ আসনে। ঐ জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে প্রধান ছয়টি দফাই ছিল কৃষি ও কৃষক শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়ন ও স্বার্থের কথা। দফাগুলো আরও বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ২১ দফা কর্মসূচিই ছিল দেশের কৃষক-শ্রমিক ও কৃষির উন্নয়নের প্রথম রাজনৈতিক দলিল। কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাাভাবনা বেশ তীক্ষ্ম ও প্রকট ছিল বলেই তাঁকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লীমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

কৃষির প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে অকৃত্তিম ভালবাসা এবং উপলব্ধি তা প্রস্ফুটিত হয়েছিলো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক বিশাল জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে। সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন- “আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারব না, তিনগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণও করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্টপরা, কাপড়পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না”।

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর যে দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ছিল

এবং কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া তার ভাষণেই ফুটে ওঠেছিল যা একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও সাক্ষ্য দেয়।

তিনি বলেছিলেন- “কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা বলছি। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের যে অবস্থা, সত্য কথা বলতে কী বাংলার মাটি, এ উর্বর জমি বারবার দেশ-বিদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ও শোষকদের টেনে এনেছে এই বাংলার মাটিতে। এই উর্বর এত সোনার দেশ যদি বাংলাদেশ না হতো, তবে এতকাল আমাদের থাকতে হতো না। যেখানে মধু থাকে, সেখানে মধুমক্ষিকা উড়ে আসে। সোনার বাংলা নাম আজকের সোনার বাংলা নয়। বহু দিনের সোনার বাংলা। বাংলার মাটির মতো মাটি দুনিয়ায় দেখা যায় না। বাংলার মানুষের মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার সম্পদের মতো সম্পদ দুনিয়ায় পাওয়া যায় না”।

তিনি আরও বলেছিলেন- “যেভাবে মানুষ বাড়ছে যদি সেভাবে আমাদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে, তবে ২০ বছরের মধ্যে বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে কারণেই আমাদের কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। আপনাদের কোট-প্যান্ট খুলে একটু গ্রামে নামতে হবে। কেমন করে হালে চাষ করতে হয়, এ জমিতে কত ফসল হয়, এ জমিতে কেমন করে লাঙল চষে, কেমন করে বীজ ফলন করতে হয়। আগাছা কখন পরিষ্কার করতে হবে। ধানের কোন সময় নিড়ানি দিতে হয়। কোন সময় আগাছা ফেলতে হয়। পরে ফেললে আমার ধান নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো বই পড়লে হবে না। গ্রামে যেয়ে আমার চাষি ভাইদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে শিখতে হবে। তাহলে আপনারা অনেক শিখতে পারবেন”।

বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষিশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থী না আসলে এই খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই কৃষিশিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন মঞ্চে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াদের মতো কৃষিবিদদের চাকরিক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা ঘোষণা করেন। সাথে সাথেই “বঙ্গবন্ধুর অবদান, কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান” ¯স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় সেই সমাবর্তন স্থলটি। তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার পথ ধরে আজ কৃষিবিদরা সরকারি চাকরিক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

শুধু তাই নয়, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের তিনি কৃষি বিপ্লব সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- “খাদ্য শুধু চাল, আটা নয়; মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারিও আছে”। কৃষি উন্নয়ন বলতে তিনি শস্য, মৎস্য, পশুপাখি ও বনসম্পদ অর্থাৎ সার্বিক কৃষি খাতের উন্নয়নকে বুঝিয়েছেন। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় আমাদের উর্বর জমি, অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, পশু-পাখি, মৎস্য, বনাঞ্চল ও পরিবেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। এসবের ওপর গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের নিদের্শনাও দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন- “খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার”।

কৃষি উপকরণের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা যা ছিল তা আজ এত বছর পরেও আমাদের আশ্চার্যন্বিত করে। মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামারভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ, বীজবিষয়ক কার্যক্রম এসবের ওপর সর্বাত্মক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এগুলো যথাযথভাবে না করতে পারলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাবো।

বঙ্গবন্ধুর মতোই তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বারবার দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান করেন যে-“এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। যে যেভাবেই পারেন, প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার সদ্ব্যবহার করবেন”। তিনি আরও বলেন- “বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ। তার পরেও বসে থাকলে চলবে না”। কৃষিবিদদের মর্যাদা নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে, কৃষিবিদ ও কৃষকের মর্যাদার প্রতীক পেশাজীবী সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন বাংলাদেশ-এর নান্দনিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে জমি বরাদ্দসহ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সময়ের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারই কৃষক-কৃষিবিদ সহায়কনীতি ও প্রণোদনায় ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৮ম,

পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম এবং মৎস্য উৎপাদনে ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে। আবাদি জমি কমেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের এক অনুকরণীয় রোল-মডেলে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজ নেই, তিনি আছেন বাংলার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মনিকোটায়। পূর্বের ন্যায় সেই খাদ্যের অভাব এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষি উৎপাদন ডাবল, ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও বেশি হয়েছে। নেই কোন খাদ্য সংকট। খাদ্যশস্যও এখন উদ্বৃত। এ দেশের কৃষক এখন আর শোষিত ও বঞ্চিত নন বরং তারা সম্মানিত। যেমনটি চেয়েছিলেন আজকের এই কৃষি উন্নয়নের অগ্রদূত “বঙ্গবন্ধু”।

ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম (সোহাগ): প্রফেসর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বাংলাদেশের মানুষ ভয়কে জয় করতে জানে

যুক্তরাষ্ট্র গত মে মাসে ভিসানীতি আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় তারা ভিসানীতি ঘোষণার কার্যকারিতার কথা জানালো। এই ভিসানীতি কার্যকারিতার কথা তারা তখন জানালো যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।
আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় গত শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়ার এক বৈঠকে আবারও বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়।

ওই বৈঠকের পর আজরা জেয়া নিজেই এক্সে (সাবেক টুইটার) সচিত্র একটি পোস্ট দিয়েছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন ও

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি সাইড ইভেন্টের আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আবারও যুক্ত হতে পেরে সম্মানিতবোধ করছি। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, অংশীদারত্বের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ৯ লাখ ৬০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে উদারতার সঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছি।’

বৈঠকে আজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেয়া রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেন।

জবাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করা উচিত, অন্যথায় এই অঞ্চল নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়বে। কারণ রোহিঙ্গারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান এবং মাদক কারবার। রোহিঙ্গারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কারণ তাদের প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে এবং তারা সেখানে কোনো ভবিষ্যৎ অনুভব করছে না।

একটা বিষয় খেয়াল করলে বুঝা যাবে, উজারা জেয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর পরই বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভিসানীতি কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছে। তাদের দাবি ছিলো, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন, তাদেরকে নিজ দেশ ফিরিয়ে নিতে যত তাড়াতাড়ি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

এ থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই যে, রোহিঙ্গাদের কর্মসংসস্থানের প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র নাখোশ হয়েছে। এই প্রস্তাব ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আর কী কী প্রস্তাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিল তা আমরা জানিনা। মনে হচ্ছে, এমন কিছু প্রস্তাব হয়তো প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল যেগুলো তিনি নাকচ করে দিয়েছেন।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায়

যুক্তরাষ্ট্র। অনেকদিন ধরে তারা সেটি বলে আসছে। বাংলাদেশের তরফ থেকেও বার বার জানানো হয়েছে যে, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হবে। তারপরও তারা ভিসানীতি আরোপ করে সেটি কার্যকর করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- নির্বাচন তো এখনও হয়নি। তার আগেই কেন ভিসানীতি আরোপ ও কার্যকর করা হলো?

এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতেই এসব ভিসানীতি, নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। গণতন্ত্র, অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক ভোট শুধুমাত্র ইস্যু। নিজের দেশেই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করতে নানান কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। নিজের দেশেই যেখানে বাইডেন প্রশাসন প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে অন্যদেশের গণতন্ত্র নিয়ে তাদের এতো মাথা ব্যাথা কেন?

বাংলাদেশেই যে তারা প্রথম ভিসানীতি আরোপ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে তা কিন্তু নয়। সাম্প্রতিক অতীত ঘাটলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র আরও বহু দেশের সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদদের উপর একইভাবে ভিসানীতি এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এটা নতুন কিছু নয়। যেখানেই তাদের স্বার্থ জড়িত সেখানেই তারা একই পথে হেঁটেছে। কিন্তু কোথাও তারা সফল হতে পারেনি। সব জায়গা থেকেই ফিরেছে শুন্য হাতে। আমরা যদি ভেনিজুয়েলা থেকে শুরু করে সিরিয়া, ইরান, মিশর, তুরস্ক, রাশিয়া, বেলারুশের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো এদের সবার উপরই নিষেধাজ্ঞা জারি কিংবা ভিসানীতি আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু খুব একটা ফল হয়নি।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই সেদেশে সামরিক অভ্যূত্থান হয়েছিল। সেই অভ্যূত্থানে যুক্তরাষ্ট্র ইন্ধন দিয়েছিল। ২০২১ সালে তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমান সৌলু যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনের বিষয়টি স্পষ্ট করেন। ভেনিজুয়েলায় নিজেদের পছন্দের লোক গুইদুকে প্রেসিডেন্ট করতে না পেরে মাদুরোকে বার বার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

পাঠকদেরকে হালের একটা তথ্য দিয়ে রাখি। যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ভারতের মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের উপরও। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। বারাক ওবামা ভারত সফরের পর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তার সফরের বেশ কিছু

দিন পর ভারত নাসার সঙ্গে চুক্তি করল।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। গুজরাট দাঙ্গার কারণে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পরবর্তিতে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্র তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি কোন দিকে যাবে, কারা সরকার পরিচালনা করবে-সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক শুধুই বাংলাদেশের জনগণ। এখানে বাইরের রাষ্ট্র সে যুক্তরাষ্ট্র হোক কিংবা অন্য কোনো দেশ হোক কারোরই হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। যখনই বাইরের কোনো রাষ্ট্র কোনো অজুহাতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবে তখনই বুঝতে হবে ওই দেশের বৃহত্তর স্বার্থ আছে। আর এসব নিষেধাজ্ঞা, ভিসানীতি আরোপে এদেশের সাধারণ মানুষের কিছুই যায় আসে না। কারণ বাংলাদেশের মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্ত করেছে এবং করছে।

শেষ করতে চাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রসঙ্গ টেনে। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছিল। শুধু বিরুদ্ধেই অবস্থান নেয়নি, তারা সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। সেই যুদ্ধে সপ্তম নৌবহর পর্যন্ত পাঠিয়েছিল রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাই ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আর আমাদের সংবাদ মাধ্যমেরও উচিত নিষেধাজ্ঞা বা ভিসানীতির বিষয়টি এতো বড় করে না দেখা। বাংলাদেশের মানুষ ভয়কে জয় করতে জানে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

টাকা পাচার বন্ধ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন, যুব ইউনিয়ন সভাপতি মাসুম

‘কর্মসংস্থান ও ভোটাধিকারের সংগ্রামে জেগে ওঠো তারুণ্য ‘ শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কুষ্টিয়া জোনের

উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি যুবনেতা আবু তোয়াব অপু’র সভাপতিত্বে ও বায়েজিদ চাষার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য চৌধুরী হোসেন, খুলনা বিভাগীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য নিত্যানন্দ ঢালী, কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মুজাহিদুল ইসলাম রিপন, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক স্বপন বাগচী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি গোলাম রাব্বানী, চুয়াডাঙ্গা জেলার আহবায়ক জিয়াউর রহমান, মেহেরপুর জেলার আহবায়ক এ্যাড. মিজানুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক সোহেল খোন্দকার, চুয়াডাঙ্গা জেলার যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ারুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সদস্য ও জাতীয় পরিষদ সদস্য সুজন বিপ্লব, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের ৯ দফা দাবী উপস্থাপন করেন এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবী জানান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য যুবনেতা মাসুম বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে যে বিপুল পরিমান টাকা পাচার হচ্ছে এই টাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে এই দেশের কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো। তিনি সরকারি চাকুরির শুন্য পদে দ্রুত নিয়োগের দাবী জানিয়ে বলেন করোনার কারনে দেশে কোটি যুবক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাদের বেশির ভাগ নতুন করে আর শ্রমবাজারে যেতে পারেনি, সরকার তাদের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয় নি। অথচ রাষ্ট্রের টাকায় ধনিক শিল্পপতিদের প্রণোদনার নামে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছে এতে যুব সমাজের কোনো কাজে লাগে নাই । করোনাকালীন কর্মহীন হয়ে পড়া ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ক্ষতিগ্রস্ত যুবদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

করোনাকালীন প্রবাস ফেরত যুবদের প্রবাসে কর্মে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।কর্মহীন যুবদের জন্য বেকার ভাতা চালু করতে হবে।

কর্ম প্রত্যাশীদের জন্য অনলাইন নিবন্ধন কেন্দ্র চালু করে নিবন্ধিত যুবদের এক বছরের মধ্যেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুষ ছাড়া চাকরি চাই, নিয়োগ ও বদলিতে বানিজ্য বন্ধ করতে হবে।

এনটিভির উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেলেন রেজ আন উল বাসার তাপস

দ্রুততম সময়ে মিলিয়ন ভিউয়ের মাইলফলক অর্জন করা ভিডিও বিবেচনায় উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেয়েছেন এনটিভির মেহেরপুরের রেজ আন উল বাসার তাপস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এনটিভির প্রধান কার্যালয়ে রেজ আন উল বাসার তাপসসহ পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। এনটিভির পরিচালক আলহাজ্ব নুরুদ্দীন আহমেদ ও মো. আশফাক উদ্দিন আহমেদ প্রত্যেক কর্মীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

এ সময় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ও তাঁর কন্যা রোজা আলী সামাভিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনটিভির সব বিভাগের প্রধান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের সাথে আগামীর পথে’ বস্তুনিষ্ঠ তথ্যবহুল সংবাদ তুলে ধরার পাশাপাশি দ্রুত সময়ে তা জনসাধারণের আরও কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছে দর্শকনন্দিত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছেছে এর ফেসবুকে পেজ, ছুঁয়েছে দুই কোটির বেশি মানুষের হৃদয়। শুধু সংবাদই না, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্তের ভিডিও দর্শকের মন জয় করে হচ্ছে ভাইরাল। ডিজিটাল প্লাটফর্মে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাদের ভিডিওচিত্র অধিক ভাইরাল হচ্ছে, তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দিতে উদ্দীপনামূলক পুরস্কার দিচ্ছে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলটি। তারই ধারাবাহিকতায় এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলীর নির্দেশনায় এবার ৩৪ জন পেলেন এই পুরস্কার।

প্রধানমন্ত্রীর অনন্য উদ্যোগ, একশ’ অর্থনৈতিক অঞ্চল বদলে দিচ্ছে দেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশে গত ২৫ বছরে দারিদ্র্য কমেছে ৫০ শতাংশের বেশি। ২০২০ সালের মে মাসেরএশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি তাদের এক প্রতিবেদনে দিচ্ছে এই তথ্য। এছাড়া ওই প্রতিবিদনে বলা হয়, গত দশ বছরে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছয় শতাংশের ওপরেই থাকছে। এর পরের বছরই দেশের মানুষের এমন অর্থৈনৈতিক সাফল্যে, মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ। এই শুভক্ষণে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য ঠিক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অর্থনীতিবিদরা বলেন, এই সাফল্যের সিংহভাগ এসেছে শেখ হাসিনা সরকারের উৎপাদন এবং বিনিয়োগবান্ধব উদ্যোগের ফলে। তিনি পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এই যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন ২০১০ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটি সব সময়ই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। ২০১৩ সালে শুরু হয় এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মূল কাজ। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ শুরু করেন। শুরু থেকেই বেজার লক্ষ্য ছিল শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উত্পাদন এবং রপ্তানী বাড়ানো। পাশাপাশি পরিকল্পিত উপায়ে দেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ।

বেজার তত্ত্বাবধানে সারাদেশে মোট ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৯৭টির জন্যেই গর্ভনিং বোর্ডের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থৈনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে চট্টগ্রামের মীরসরাই সীতাকুণ্ড এবং ফেনি মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিব শিল্পনগর। এর আয়তন প্রায় ৩০ হাজার একর । এটিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম একটি শিল্পনগর ভাবা হচ্ছে। এই শিল্পনগরীর মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। শুরু হয়েছে অবকাঠামো নির্মাণ। এই শিল্প নগরে একটি পূর্ণাঙ্গ শহরের সম্ভাব্য সব নাগরিক সুবিধা থাকবে। বিশেষজ্ঞরা আরও জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে আগামী ২০ বছরে প্রায় ১৫ লাখ মানুষের কাজের ব্যবস্থা হবে।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ হচ্ছে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুরে। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী এর ভিত্তি প্রস্তর বসান। শুরু থেকেই বলা হচ্ছে এখানে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ হবে। পাশাপাশি কাজের যোগাড় হবে সিলেট বিভাগের প্রায় ৪৪ হাজার মানুষের।

জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ৪৩৬.৯২ একর জায়গায় জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের নির্মাণ চলছে। এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও মাস্টার প্লান শেষ হয়েছে। বিসিকসহ এ অঞ্চলে ৫২ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের মহেশখালীতে আরেকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের কাজ চলছে।

প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগ অনুযায়ী চারটি পর্যায়ে বিনিয়োগ হবে। এগুলো হচ্ছে সরকারি পর্যায়, বেসরকারি পর্যায়, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারী পর্যায়ে এবং বিদেশি পর্যায়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা ১২ বছরের আয়কর সুবিধা পাবেন। আরো থাকছে স্থানীয় ক্রয় থেকে ভ্যাট মওকুফ, কাস্টমস শুল্ক সুবিধা, জমি রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ এবং ডিভিডেন্টে ট্যাক্স মওকুফের সুবিধা। বিনিয়োগকারী শিল্প উদ্যোক্তারাও পাবেন ১০ বছরে আয়কর সুবিধা, কাঁচামাল আমদানীতে ডিউটি অবকাশ, যেকোন পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ সুবিধা এবং জমি রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ। এছাড়াও লভ্যাংশ কর, রয়েলটি ও কারিগরি ফি থেকে অব্যাহতি পাবেন উদ্যোক্তারা

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা স্থাপন করছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো। বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে আসা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে চীনের ৯টি, যুক্তরাজ্যের ৫টি, ভারতের ৪টি, অস্ট্রেলিয়ার ৪টি, জার্মানির ২টি, যুক্তরাষ্ট্রের ২টি, জাপানের ২টি, নেদারল্যান্ডসের ২টি, সিঙ্গাপুরের ২টি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া নরওয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের একটি করে প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখন

পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে ৩০৯ কোটি ৪৩ লাখ ডলার এবং দেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে দুই হাজার ৫১৮ কোটি ১৭ লাখ ডলারের।

বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে বিদেশিদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ অঞ্চল। চীন ও জাপানের বিনিয়োগ বাড়াতে নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে নির্মাণ হচ্ছে দুটি অঞ্চল। ভারতের জন্য থাকছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের একটি অংশ ও মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল। সৌদি আরব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে একটি অঞ্চল করার প্রস্তাব দিয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে কিছু প্রতিষ্ঠান উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শুরু করেছে। বিশ্ব মহামারী করোনার সংক্রমনের সময়েও এখানে বিনিয়োগ হয় ৬ মিলিয়ন ডলার। এমনকি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগ কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা ছিল সেটিও সত্য হয়নি।

বিনিয়োগকারীদের নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তা দেয়ার জন্যে জাইকার কারিগরি সহায়তায় একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় বিনিয়োগকারীদের ১২৫ ধরণের সেবা দেয়া হচ্ছে। যার মধ্যে ১৭ টি সেবা অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অনলাইনে সেবা আরো বাড়ানো হচ্ছে।

এছাড়াও অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতায় কক্সবাজারে তিনটি ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে । এগুলো হচ্ছে সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক । সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কটি হবে মহেশখালীর চর মকবুল, চর ভরাট ও সমুদ্র বিলাস এলাকায়। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত ট্যুরিজম পার্ক। টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদীর পাড়ে মনোরম জালিয়া দ্বীপে প্রতিষ্ঠা হবে এই পার্ক। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলার সাগর তীরে।

এসব পার্কে পাঁচতারকা হোটেল, ইকো-ট্যুরিজম, মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম, সি-ক্রুজ, ভাসমান জেটি, শিশু পার্ক, পানির তলদেশে রেস্টুরেন্ট, ভাসমান রেস্টুরেন্ট, ঝুলন্ত সেতুসহ বিনোদনের নানা বিষয় যুক্ত করার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে পার্কগুলোতে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠা হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন অঞ্চলে এখন

পর্যন্ত প্রায় ৪১ হাজার লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের সক্রিয় হিযবুত তাহরীর

প্রতিবছরই তারা এই আয়োজন করলেও এবারের অনলাইন সম্মেলনের টাইমিং ও উদ্দেশ্য প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, নিষিদ্ধের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও হিযবুত তাহরীরের দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আর পুলিশ বলছে, প্রচারণা থাকলেও বড় নাশকতার সক্ষমতা নেই জঙ্গি সংগঠনটির।

ঢাকার বেশকিছু ব্যস্ততম এলাকায় নতুন করে প্রচারণায় নেমেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর। ডেকেছে অনলাইন সম্মেলনও। সেই সম্মেলনের প্রচারণার পোস্টারে সয়লাব রাজধানীর বিভিন্ন দেয়াল। রাজধানীর পল্টন, সিদ্ধেশ্বরী, বাংলামোটর, রামপুরা, কলাবাগান এলাকার দেয়াল ছেয়ে গেছে নিষিদ্ধ সাংগাঠনের পোস্টারে।

এলাকার লোকজন বলছেন, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর কোন একসময় পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে। তবে কারা কীভাবে লাগিয়েছে তা জানেন না স্থানীয়রা। তবে তাদের শঙ্কা, এভাবে ওরা সংগঠিত হয়ে বড় ধরনের কোন অপকর্ম ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। একটি নিষিদ্ধ সংগঠন চোখের সামনে তাদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এব্যাপারে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘আমি মনে করি না বিষয়টি শুধু পোস্টারিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুলিশের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য যে ইউনিটগুলো কাজ করছে, তাদের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পোস্টার লাগিয়ে যখন কেউ নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। তাদেরকে খুব ক্যাজুয়ালি নেওয়ার কিছু নেই, তারা বিপদজনক।’

এদিকে পোস্টার লাগানোর ১২ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কারা কোথা থেকে এসে পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেলো সে নিয়ে কোন তথ্য নেই থানায়। কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এখনও আমি বিষয়টি অবগত নই। আমি টহল টিম পাঠিয়ে এখনই খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যদি তারা কোনো ধরনের প্রচারণা চালিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনা ঘটার পরে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মধ্য দিয়ে সুরাহা করা যাবে না উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলাজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের অধ্যাপক জিয়া রহমান বলেন, ‘অপরাধ দমনের জন্য প্রঅ্যাকটিভ ও রিঅ্যাকটিভ দুটো পদ্ধতি থাকে। আমাদের এখানে প্রঅ্যাকটিভ উদ্যোগ দেখা যায় না। আমাদের যেনো দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো সিরিয়াসলি দেখা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করে এগুলো থামানো দরকার। ভুলে গেলে চলবে না ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’

২০০৯ সালে সরকার হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বারবার তাদের উপস্থিতি জানান দিতে তৎপর এ জঙ্গি সংগঠনটি। কথিত খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কখনও মিছিল আবার কখনও ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আর আয়োজকরা চিহ্নিত হলেও এখনো তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

পদ্মা সেতুর আয় হাজার কোটি টাকা ছাড়াল

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের দ্বার পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয়েছে প্রায় এক বছর তিন মাস আগে। এখন পর্যন্ত পদ্মা সেতু থেকে টোল আদায় হয়েছে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি। সেতু কর্তৃপক্ষের হিসাব বলছে, প্রতিদিন গড়ে ১৫ হাজার যান চলাচল করে পদ্মা সেতু দিয়ে। আর তাতে প্রতিদিন গড়ে ২ কোটি ১৫ লাখ টাকার মতো টোল আদায় হয় পদ্মা সেতুর দুই প্রান্তের টোল প্লাজা থেকে।

গত বছরের ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরদিন ২৬শে জুন পদ্মা সেতু জনসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ২০২২ সালের ২৬ জুন থেকে বুধবার সকাল ১০টা পর্যন্ত মাওয়া ও জাজিরার দুই টোল প্লাজায় ৭২ লাখ ৯৬ হাজার ৬২২টি যানবাহন সেতু অতিক্রম করে। এতে এখন পর্যন্ত ক্রেডিট ও ইটিসিএসসহ এক হাজার কোটি ৯২ হাজার ১৫০ টাকা টোল আদায় হয়েছে।

সেতু কর্তৃপক্ষের হিসাব বলছে, একদিনে সর্বোচ্চ টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ৯১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত । সেদিন ৩৫ হাজার ৫২৪ যানবাহন পদ্মা সেতু অতিক্রম করে। ওই দিন মাওয়া প্রান্তে টোল আদায় হয়েছিল ২ কোটি ২৩ লাখ ৪৯ হাজার ১০০ টাকা এবং জাজিরা প্রান্তে টোল আদায় হয়েছিল ১ কোটি ৬৮ লাখ ৯০০ টাকা।

পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর ২০২২ সালের ২৫ জুন থেকে ২০২৩ সালের ২৪ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত পদ্মা সেতু দিয়ে মোট ৫৬ লাখ ৭৫ হাজার যানবাহন পারাপার হয়েছে। এসব থেকে মোট আয় হয়েছে ৭৯৮ কোটি ২৩ লাখ ৯৬ টাকা। তার প্রায় তিন মাস পর হাজার কোটি টাকা ছাড়াল এই আয়।

৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার উন্নয়নের সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পদ্মা সেতু দিয়েচলবে ট্রেন। আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে রেল চলাচল শুরু হবে। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন এই রেলপথের উদ্বোধন করবেন। পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চলাচলের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়কে প্রথম বছরেই সেতু বিভাগকে দিতে হবে ১০৬ কোটি টাকা। এ থেকেও আয় আসবে পদ্মা সেতুর।

দেশের সবচেয়ে দীর্ঘ এই সেতু নির্মাণে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় মূলত অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে ঋণ হিসেবে দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আদায় হওয়া টোল থেকে গত ৫ এপ্রিল প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ৩১৬ কোটি ৯০ লাখ ৯৭ হাজার ৪৯ টাকা সরকারকে পরিশোধ করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

করোনায় মোকাবেলায় সরকারের চেষ্টা ছিল সর্বাত্মক

করোনাকালের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। বেশিদিন আগের কথা নয়। ২০২০ সালের গোড়ার দিকে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ মহামারী লেগেছিল। ইউরোপের দেশে দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন। ইউরোপ ছাড়িয়ে সেই মড়ক লেগে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশে। ২০১৯ সালে চীনের উহান প্রদেশ থেকে যে করোনার সূত্রপাত সেটি উহান ছাড়িয়ে চীনের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় দাবানলের মত। তারপর সুপারসনিক গতিতে বিশ্বকে শাসন করতে শুরু করে। মাত্র কয়েক মাসে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সেই মহামারী বাংলাদেশেও আঘাত হানে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। তারপর ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। পরিস্তিতি জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করে। পুরো বিশ্ব যেখানে কোভিড-১৯ নিয়ে চরম অস্থিরতার মধ্যে তখন বাংলাদেশের সামনে কোভিডের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু বাঙালি যে দমবার পাত্র নয়।

বিশ্বজুড়ে কোভিডের টিকা আবিস্কারের প্রতিযোগিতা শুরু হলো। বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব দ্রুত সেই টিকা আবিস্কারে মনোযোগ দিলো। বছর খানের মাথায় যখনই টিকা আবিস্কার একটা পর্যায়ে, তখন শুরু হলো কার আগে বা কোন দেশ কার আগে করোনার টিকা পাবে। যতো টাকার বিনিময়েই হোক।

কিন্তু টাকা থাকলেও তো টিকা পাওয়া কঠিন। এটা সবাই জানে। কারণ পৃথিবী ব্যাপী যে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে তা সামাল দিতে যে পরিমাণ টিকার উৎপাদন হওয়া দরকার ওই সময়ে সেটা হচ্ছিল না। এই অবস্থায় বিশ্বজুড়ে রীতিমত টিকার জন্য হাহাকার শুরু হলো।

বাংলাদেশ সেই দৌড়ে এগিয়ে গেলো, বলতে গেলে সবার আগে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের পুরো কোভিড পরিস্থিতি নিজেই মনিটরিং করছিলেন। বাংলার একজন মানুষও যাতে বঞ্চিত না হয় সে জন্য তিনি সব ধরণের উদ্যোগ নেন। ইংল্যান্ড, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ টিকা উৎপাদনকারী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হলো। সেই যুদ্ধে বাংলাদেশ জয়ী হলো অবিশ্বাস্যভাবে। যে কয়টি উন্নয়নশীল দেশ

প্রথম ধাপে টিকা পায় তারমধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে শেখ হাসিনার সরকার চড়া মূল্যে টিকা কিনে বিনামূল্যে সেটি মানুষের মধ্যে সরবরাহ করে। যদিও পরবর্তিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক চেষ্টা আর কূট্নৈতিক দক্ষতায় বাংলাদেশ করোনা টিকা ক্রয়ের পাশাপাশি বিনামূল্যেও টিকা পায়।

তবে শুরুর দিকে বাংলাদেশে যখন কোভিড ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তখন দেশের মানুষকে এই অতীমারির হাত থেকে বাঁচাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও লকডাউন ঘোষণা করা হয়। টানা ৬৫ দিন চলে লকডাউন। কিন্তু কোভিডকে তো আর লকডাউন দিয়ে আটকানো যায়নি। রাজধানীর গণ্ডি পেরিয়ে করোনা ছড়িয়ে পড়ে ৬৪ জেলায়, গ্রামে গঞ্জে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সংকট দেখা দেয় চিকিৎসা ব্যবস্থায়। চিকিৎসক, নার্সরা সেবা দিতেও ভয় পাচ্ছিলেন। তার উপর এই চিকিৎসার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিলো না দেশের চিকিৎসকদের। এটি মোকাবেলা সরকারেরও কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না। যার ফলে পরিস্তিতি সামাল দিতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হয় সরকারকে।

প্রতিদিনই শহরের প্রধান প্রদান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলিতে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দে মানুষের ঘুম যেমন ভাঙ্গত। তেমনি গভীর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেই সাইরেনের শব্দই কানে বাজতে থাকে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর ঠাঁই হচ্ছিল না। আইসিইউ আর ভেন্টিলেশন সংকটে রোগীদেরকে নিয়ে তাদের স্বজনরা এই হাসপাতাল, ওই হাসপাতাল করতে করতে এক সময় সেই প্রিয় মুখটি হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। এই যখন অবস্থা তখন মানুষ বাঁচাতে সরকারের তরফে নানামুখি পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

প্রথম ধাপে সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। একই সঙ্গে রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, মহাখালী শেখ রাসেল গ্যাস্টো লিভার হাসপাতাল, মুগদা জেনারেল হাসপাতালসহ সরকারি-বেসরকারি বেশ কয়েকটি হাসপাতালকে কোভিডের চিকিৎসার জন্য ডেডিকেটেড করে দেওয়া হয়।

দেশের সকল জেলা পর্যায়ে ১০০ বেড, উপজেলা পর্যায়ে ৪০ থেকে ৬০টি বেড, মেডিকেল কলেজগুলোতে ৩০০ বেড এবং রাজধানীর কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালসহ অন্যান্য হাসপাতালে ৫০০ থেকে ১০০০ বেড করোনা ভাইরাস আইসোলেটেড করে রাখা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য বিশেষ ভাতা চালু করা হয়। হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একাধিক হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু করা করা হয়। আইসিই ‘র সংখ্যা বাড়ানো হয়।

দেশে মহামারী নিয়ন্ত্রণে শেখ হাসিনার সরকারের সব পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের প্রতি তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় কোভিড সরবরাহের মাধ্যমে। এভাবেই কোভিড-১৯ থেকে ধীরে ধীরে পরিত্রাণ পায় বাংলাদেশের মানুষ।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারের বিশেষ উদ্যোগে তড়িৎ দুই হাজার চিকিৎসক এবং পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে দেশে কোভিড মোকাবেলায় চার হাজার চিকিৎসক, ১৪ হাজার, ২১ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবকসহ প্রায় ৪০ হাজার জনবল কাজ করে। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

ভ্যাকেসিনের দিক থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলো মধ্যে সেবার আগে যেমন কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন দিতে পেরেছে, তেমনি সারাদেশের সব বয়সী মানুষের মধ্যে চার ধাপে মোট সর্বমোট ৩৬ কোটি ৬৭ লাখ ২১ হাজার ২৪৬ ডোজ টিকা দেয়। এসব টিকার মধ্যে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে টিকার একটার বড় অংশ ক্রয় করে। বাকি টিকা বিনামূল্যে পেয়েছে। প্রথম ধাপে ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ওই বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে প্রথম ধাপের টিকা কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে টিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ দেওয়া হয়। এখন চতুর্থ ডোজের কার্যক্রম চলমান।

বিশ্বব্যাপী যখন করোনায় লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে তখন বাংলাদেশে সেই হার খুবই কম। শেখ হাসিনার সরকারের সর্বাত্মক চেষ্টায় মহামারীর মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাতে সফলতাও এসেছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশংসিত হয়েছেন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

আদিলুরের রায় নিয়ে ‘অপতৎপরতায়’ ১৫৫ জন বিশিষ্ট নাগরিকের উদ্বেগ

অসত্য তথ্য প্রচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় বেসরকারি সংগঠন ‘অধিকার’ এর সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এস এম নাসির উদ্দিনের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্নমহল অপতৎপরতা চালাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ১৫৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদ।

মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) শিল্পী অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগের কথা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে মতিঝিল, শাপলা চত্বর, পল্টন ও তার আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। এসব ধ্বংসযজ্ঞ চলাকালে পুলিশের সাথে হেফাজতে ইসলামের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকার’ ২০১৩ সালের ১০ মে ‘হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সমাবেশ ও মানবাধিকার’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার লেখা, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা, অন্য ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের নাম এই তালিকায় সন্নিবেশ করাসহ কাল্পনিক ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করে ওয়েবসাইটে অতিরঞ্জিত ও অসত্য তথ্য প্রকাশ করে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টির মানসে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে অসত্য ও বিকৃত তথ্য প্রচারের অভিযোগ এনে একই বছর সংস্থাটির বিরুদ্ধে সাইবার ট্রাইবুনালে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে গত ১৪ সেপ্টেম্বর অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিনকে দুই বছর কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা

অর্থদণ্ড প্রদান করে আদালত রায় প্রদান করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, রায়ে কোনও পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও একটি মহল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেছে। আমরা মত প্রকাশের অধিকারকে সমুন্নত রাখা যেমন অপরিহার্য বলে মনে করি, তেমনি মত প্রকাশের অধিকারের অজুহাতে যেন মানবতাবিরোধী উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী দোসররা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ না পায়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি বলে মনে করি।

বিবৃতিতে বলা হয়, এই রায় প্রকাশের পর বিতর্কিত, উগ্রবাদী সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সুরে দেশি-বিদেশি কিছু সম্মানিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদ করার বিষয়টি বিস্ময়কর। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এসব ব্যক্তি ও সংগঠন বাংলাদেশের উগ্র-সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর জন্য উদ্বিগ্ন হলেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা, ৩ নভেম্বর জেলহত্যাকান্ড, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ, ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারাদেশে একযোগে সিরিজ বোমা হামলা ও বিচারক হত্যার মাধ্যমে সারাদেশে জেএমবি কর্তৃক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম এবং নিরীহ মানুষ হত্যার বিষয়ে নিশ্চুপ থাকেন। এ থেকে বোঝা যায়, এসকল দেশি-বিদেশি মহল বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ও উগ্রজঙ্গিবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক।

সময়ে সময়ে তাদের তথাকথিত বিবেক জাগ্রত হয়। আমরা এ সকল গোষ্ঠীর অপতৎপরতা সম্পর্কে দেশের
বিবেকবান নাগরিকদের সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন- এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. বজলুল হক খন্দকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক অনুপম সেন, শিল্পী হাশেম খান, সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক অধ্যাপক বুলবন ওসমান, শিল্পী রফিকুন নবী, বিশ্ব শিক্ষক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাহফুজা খানম, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সাবেক সভাপতি ডাঃ কামরুল হাসান খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

(বিএসএমএমইউ) সাবেক উপাচার্য ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্ত, বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদের সভাপতি অধ্যাপক জামাল উদ্দিন আহমেদ, বিএসএমএমইউ অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী, কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য, সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাংবাদিক অজয় দাশ গুপ্তা, কবি তারিক সুজাত, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর ড. মোঃ আমজাদ আলী, অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফিক শাহরিয়ার), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামূল হক ভূঁইয়া, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ, অধ্যাপক ড. সীমা জামান অধ্যপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মঈন, অধ্যাপক ড. মো: জিয়া রহমান, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ অহিদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল, ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, ড. মো. আবদুর রহিম, ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, ড. মোঃ রহমত উল্লাহ, ড. মোঃ আকরাম হোসেন, সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী।

বিবৃতিতে আরও স্বাক্ষর করেছেন- কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ আফজাল হোসেন, ড. ফিরোজ আহমেদ, অধ্যাপক ড. আবু সারা শামসুর রউফ, ড. মোহাম্মদ শওকত আলী, অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাসুদুর রহমান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শামছুদ্দিন, ড. শাহ মোঃ মাসুম, অধ্যাপক শেখ আফজাল হোসেন, ড. মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী, ড. গোবিন্দ চক্রবর্তী, ড. মোঃ ফজলুর রহমান, ড. মো: বায়তুল্লাহ কাদেরী, ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ, অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. জামাল উদ্দীন চৌধুরী, মহাসচিব অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান মিলন, বিএসএমএমইউ’র সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ, চিকিৎসক নেতা ডা. এম ইকবাল আর্সলান, ডা. মামুন আল মাহতাব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শহীদ ইকবাল, ড. হাসিবুল আলম প্রধান, ড. বিশ্বনাথ সিকদার, ড. জান্নাতুল ফেরদৌস, ড. মীর ইবনে ওয়াহেদ, ড. দুলাল চন্দ্র রায়, ড. এম.

আরিফুর রহমান, ড. শুভ্রা রানী চন্দ, ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে, ড. শাতীল সিরাজ, ড. ফায়েকুজ্জামান, ড. বিপ্লব মল্লিক, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক ড. মাহবুবুর রহমান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. শরীফুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক মো. আসাদুজ্জামান মন্ডল, শের ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আসলাম, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শাহ আলমগীর, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. সাদ উদ্দিন মাহফুজ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদ আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আৰু সালেহ, সাধারন সম্পাদক জাকিয়া সুলতানা মুক্তা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি রিয়াদ হাসান, সাধারন সম্পাদক মিসেস জান্নাতুল ফেরদৌস, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কে এম মঞ্জুর মুর্শেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিক, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. আব্দুল হক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এস. এম. ফিরোজ, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. লক্ষর এরশাদ আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. শফিকুন্নবী সামাদী, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. বোরাক আলী, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম সাইফুল্লাহ, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. মাসুদের রহমান, রাজশাহী প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. রবিউল আওয়াল, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. চন্দ্রানী নাগ, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হাকিম, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সৈয়দ মো. গালীব, সাধারন সম্পাদক, অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুজ্জামান জাহিদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ জেড এম রুহুল মোমেন, অধ্যাপক ড. মো. জাকারিয়া মিয়া, ড. মো. আশরাফ-উল-আলম, ড. পরিমল বালা, ড. মো. নূরে আলম আব্দুল্লাহ, ড. মো. আনোয়ার হোসেন, ড. মো. মমিন উদ্দীন, ড. মোস্তফা কামাল, চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ড. রাশেদুন নবী, ড. নাছিম হাসান, ড. জ্ঞান রত্ন মহাথেরো, ড. শ্যামল রঞ্জন চক্রবর্তী, ড. আনোয়ার সাঈদ, ড. মোঃ খায়রুল ইসলাম, ড. নাজনিন নাহার ইসলাম, ড. জামাল উদ্দীন,ড. রাহমান নাসির উদ্দীন, ড. হেলাল উদ্দিন, ড. এস. এম. মনিরুল হাসান, অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুল হক, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মুহিবুল আজীজ, ড. এস. এম. রফিকুল আলম, ড. মো. দানেশ মিয়া, ড. এফ এম এনায়েত হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. সেকান্দার চৌধুরী, অধ্যাপক ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মো. জসীম উদ্দিন, অধ্যাপক মনজুর আলম, অধ্যাপক এ বি এম আবু নোমান, ড. নেয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুর, ড. মো. আনিসুজ্জামান, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ, ড. মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, ড. মো. আতিকুর রহমান ভূইয়া, ড. সুকল্যাণ কুমার কুণ্ডু, ড. আলমগীর কবির, ড. এমরান জাহান, ড. মো. আমিনুল ইসলাম, ড. মো. খবির উদ্দিন, ড. হোসেন মো. সায়েম, শিল্পী অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী, এবং অধ্যাপক ড. মেজবাহ উদ্দীন।